একক ৪ ❑ ছোটোগল্পের শৈলী

৪.১ ছোটোগল্পের শৈলীবিচার

৪.২ পথহারা পথিক

৪.৩ উদাহরণ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুষ্করা'

৪.১ ❑ ছোটোগল্পের শৈলী

কিছুদিন আগে এক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ছোটোগল্পের সূত্রে বলেছিলেন, ছোটোগল্পে প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য থাকলেও প্রকরণের বৈচিত্র্য কোথায়? প্রশ্নটাকে উলটো করে সাজালে বোধহয় ভালো হয়। প্রসঙ্গ (বিষয়) যদি প্রবৃত্তির দিক দিয়ে ধরি, তাহলে তার বৈচিত্র্য সীমাহীন নয়। ক্ষুধা (দৈহিক বা মানসিক), রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি, প্রেম, ধর্ম, ঈর্ষা, যশ, বিশ্বাস (প্রচলিত মূল্যবোধে আস্থা), হিসাব (জীবনে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খতিয়ান), ব্যাখ্যা (জীবনের বিশ্লেষণ) এবং হিংসা (মানসিক ও শারীরিক দ্বন্দ্ব)—এই প্রসঙ্গাবৃত্তের বাইরে প্রবৃত্তির দোলাচল আঁকা যায় কি?

তাই প্রসঙ্গ যদি অনন্ত না হয়, প্রকরণের সমূহ সম্ভাবনাও ছকবন্দি করা যায় না। প্রসঙ্গ কে কীভাবে দেখেন, কীভাবে গল্পের বুনোটে পাঠকের মন কাড়েন—ছোটোগল্পের শৈলী মানে তাই। এই বলার ভঙ্গি এবং দৃষ্টিভঙ্গি এক লেখকের ছোটোগল্পকে অন্য লেখক থেকে আলাদা করে। অবশ্য কোনো লেখক চলে-আসা প্রসঙ্গের হাত এড়াতে মানসিকতা অনুযায়ী বিশেষ শ্রেণী, সমাজের অবহেলিত প্রান্তগুলিকে প্রসঙ্গের সীমা ভাঙার কাজে লাগান। আর প্রকরণের বৈচিত্র্য যদি নাই থাকবে, তাহলে একই লেখক নিজের ছোটোগল্পের বাচনভঙ্গি পাল্টান কেন?

অবশ্য প্রসঙ্গ ও প্রকরণের একতা যে-কোনো শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পের প্রাণ। প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই বাচনভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু লেখার ভঙ্গি একই ছোটোগল্পের আস্বাদনকে পৃথক করে। উদাহরণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, ছোটোগল্প কারো কাছে সহজ সরল প্রাঞ্জল রচনা, কারো কাছে তা চাবুকের কড়া আঘাত। অন্যজনের কাছে তা একটি মুহূর্তের চূড়ান্ত অনুভব (মোমেন্ট'স মন্যুমেন্ট), যেখানে আর সবই তার অধীন। কখনও বলি তা গবাক্ষের আলোর মতো কিংবা 'বুলস্ আই' লণ্ঠনের মতো—একটি বিশেষ প্রসঙ্গকে আলোকিত করাই তার কাজ।

ছোটোগল্পে উপন্যাসের মতো চরিত্রের ভিড় নেই। বিরাট দর্শন আওড়ানোর অবকাশ সেখানে থাকে না। উপন্যাসের মতো সামাজিক মানুষের বিশদ বর্ণনা বা প্রতিবেশের ভূমিকা সেখানে জোড়া যায় না। গল্পের শুরুতে সংকটের কাছাকাছি অথবা ক্রমশ সংকটকে প্রকাশ করার দায় লেখকের থাকে। জটিলতা থেকে বা সরলতা থেকে জটিলতার প্রান্তে গল্পকে দ্রুততালে উপসংহারে নিয়ে যেতে হয়। কখনও কয়েকটি বাক্য তার

ইচ্ছাপূরণ করে থাকে। এগুলিকে বীজবাক্য বা কী-ওয়র্ড বলতে পারি। গল্পের এই মিতায়তন ছোটোগল্পকে উপন্যাসের চেয়ে উঁচুদরের প্রত্যক্ষতা দান করে।

এ পর্যন্ত পড়ে মনে হতে পারে যে, আমরা নিজেদের অজান্তে বোধহয় ছোটোগল্পের প্রসঙ্গ আর প্রকরণ নিয়ে একটি বাঁধা ছকের কথা আনতে চাইছি। চিন্তার একটি ছক নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু ছোটোগল্পের রূপ আমাদের নির্দেশমতো হবে, এমন ভাবনা আমাদের নেই। কেননা, বনফুল যেমন পোস্টকার্ডের সীমায় গল্প লেখেন, তেমনি হেনরি জেমসের 'টার্ন অব দা স্ক্রু' কিংবা হারমান মেলভিলের 'বিলি বাড' জটিল এবং বড়ো আকারের। ছোটোগল্পের একমুখিতা থাকলেও এডগার অ্যালান পো-র নির্দেশমতো একবারে বসে দেড় ঘণ্টা বা দু-ঘণ্টায় পড়ে ফেলা যাবে, এমন ফতোয়া জারি করা কঠিন। বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এমন সময়সীমা ভেবে লেখেননি। বোধহয় কেউই লেখেন না।

ছোটোগল্প আকারে তন্বী হবে—এমন ধারণা পিছনে ফেলে এবার বলার ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা যায়। ব্যক্তিকথা (অ্যানেকডোট) থেকে ছোটোগল্প অন্য পথচারী। সরল, অবিশদভাবে একটি ঘটনার ছুটে চলা ব্যক্তিকথার ধর্ম। প্লটের এই সারল্য কোনো কোনো গল্পলেখক মানলেও ছোটোগল্পের প্লটরীতি বিষাদান্ত, ব্যঙ্গাত্মক হতে পারে। গল্প নানা দৃষ্টিকোণের (পয়েন্ট অব ভিউ) পরিচয় থাকে—তা কল্পকাহিনী, বাস্তবঘেঁষা কিংবা প্রকৃতিবাদী হতে পারে। লেখক গল্প শুরু করেন প্রথম বা উত্তম পুরুষে—কথক ও লেখক ক্রমশ একাকার হয়ে যেতে থাকে। কখনও গল্পও একটি বিবৃতিমূলকতার চেহারা নেয়। চেখভের চরিত্রপ্রধান গল্পে এমন ভঙ্গি বেশি। হেমিংওয়ের 'এ ক্লীন ওয়েল লাইটেড প্লেস' গল্পে বুড়ো মাতালের কাহিনী দুজন ওয়েটার চালিয়ে গেছে, মাঝে মাঝে এদের একজনের চিন্তাও এসেছে। আবার ঘটনাপ্রধান গল্পে ঘটনার গতি ও ফলশ্রুতি মনোযোগ কাড়ে। নিরীহভাবে ঘটনাপ্রধান গল্পও ধীরে ধীরে পাঠককে তার জটিলতায় উদ্বিগ্ন করে—লেখকের ঝোঁক কোন্ দিকে সেটা আগে-ভাগে আঁচ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সংকটের তীব্রতায় কোনো ছোটোগল্পের যবনিকা ওঠে। তীক্ষ্ণ বাদানুবাদ বা একটি চূড়ান্ত মুহূর্তে অনায়াসে এই কাজ করে দেয়। কখনও শুরুটা গায়কের আলাপের মতো তাড়াহুড়ো নেই। কিন্তু গল্পের পারানি সঠিক পারঘাটায় পৌঁছে দেয়। বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পে বিরাট আয়োজন নেই। কিন্তু সামান্য আবেগও পাঠকের মনে সূক্ষ্ম কাঁপন জাগায়। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের সমাপ্তিতে 'চন্দরা কহিল—মরণ!' উক্তিতে পাঠকের মনোভূমি চরিত্রটির জটিলতায় আলোড়িত হয়। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দোসর', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'স্টোভ' গল্পে পাঠক এক অজানা বিস্ময়ের মুখোমুখি হন। তিনটি গল্পেই কমবেশি শাণিত ভাষার ব্যবহার আমাদের মনে বিস্ময়রস আনে। শুরু মধ্যাংশ, শেষাংশ নিয়ে গল্পের যে প্লট ভাবা হয় তারও হেরফের আছে। কখনও গল্পের শেষাংশ শুরুতে বলা হল, লেখক বাকিটুকু জানান শেষাংশের ভূমিকারূপে। এখানে রূপ এমন চেহারা নেয়—একটি উপসংহার, তারপর কী করে, কেন-র জাল বোনা।

লেখক লিখে চলেন, গল্প আপনি তার সমাপ্তিতে পৌঁছে যায়—রচক এমন করে বললেও আলোচক মেনে নিতে পারেন না। সৃষ্টিকর্ম যতই জটিল ও গভীর হোক না কেন, গল্পের গঠন সম্পর্কে একটি ধারণা স্রষ্টামনে কাজ করে। সেই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে লেখকের সজ্ঞান অংশের না হলেও এর অভাবে অসাধারণ প্রসঙ্গও সামান্য চেহারা নেয়। অন্যদিকে গল্পগঠনের মানসিক পরিকল্পনা যার কাছে স্পষ্ট, তিনিই সার্থক

ছোটোগল্প লিখে থাকেন। গল্পের এই বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ স্তরের দ্বন্দ্বমূলক অবস্থান সম্পর্কে আলোচক অবহিত থাকলে অনেক সামান্য রেখাচিত্রকে (স্কেচ) গল্পের শিরোপা পরাবেন না।

আবার রাজনীতি আমাদের শিল্পবিচারে কাজে লাগানো হয় অনেক সময় স্থূলভাবে। পাঠকের পছন্দসই রাজনৈতিক বিশ্বাস লেখায় সামান্য ছড় টানলেই তা শিল্পের ছাড়পত্র পায় না। রাজনৈতিক বিশ্বাসকে চরিত্রের প্রত্যয় থেকে উঠে আসতে হবে। নইলে বলবার ভঙ্গি অগোছালো, কোনোভাবে বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনে নোঙর বাঁধার চেষ্টা করতে গেলে ব্যর্থতাই বাড়বে। মানিকের অজস্র ছোটোগল্পে বলার ভঙ্গি এবং প্রসঙ্গের স্বাভাবিকতা খুঁজে দেখি না বলে একটা ভ্রান্তির অবকাশ তৈরি করি। মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, গান্ধীবাদ যাই লেখককে আলোড়িত করুক না কেন, তাকে চরিত্র-প্লটের বিশ্বাসযোগ্যতা দান করতে হবে।

গদ্যের শৈলীতে যেমন অলখ নিরঞ্জনের কথা তুলেছি, তেমনি ছোটোগল্পে বলার কিছু না থাকলেও অনেকে লিখতে লিখতে লেখক হয়ে যাচ্ছেন। এরা সেই বার্তের বলা লিখিয়ে, রচক নন। সংবাদপত্রের দাক্ষিণ্য, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, অন্য মাধ্যমে (যেমন কবিতায়) দক্ষতা ছোটোগল্পকার করে তোলে না। এক বিশেষ বয়সের রোমান্টিক ইচ্ছাপূরণের জন্য এরা অজস্র লিখেছেন এবং লিখে চলেছেন। উপসংহারও এদের কাছে অসম্ভবের সামিল। এখানে গল্পের ভান থাকলেও সামাজিক যে মানুষটি ব্যক্তিভাবনার উৎকেন্দ্রিকতাকে সংযত করতে পারে, তার কণ্ঠরোধ করা হয়। এরা শিল্পের জন্য শিল্প বলে প্রসঙ্গহীন, সাদামাটা, প্রকরণে, ভাষার চাকচিক্যে পাঠকের মন ভোলান। উদার মানবিকতা এবং যৌবনচাঞ্চল্যের নামে, বৈজ্ঞানিক শিরোনামায় অবৈজ্ঞানিকতার প্রহসন এনে এইসব লেখক নিজেকে এবং পাঠককে বঞ্চনা করে আনন্দ পান কাঞ্চনমূল্যের প্রসাদে। এঁদের একাধিক শ্রেষ্ঠ গল্প বাজারে চালু থাকে। কিন্তু কোন্ লেখক জীবনে কটি শ্রেষ্ঠ গল্প লিখেছেন, তার বিচার নিজে নিজে করা যায় না, তা করে পাঠক এবং মহাকাল।

যুগের অবিচারে, বিজ্ঞানের ধ্বংসী রূপের একান্ত চিন্তায় কিছু লেখক এত পীড়িত যে, মনে হয় আমাদের চারপাশে বিকারী (পারভার্টেড/অ্যাবনর্মাল) মানুষেরই ভীড়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভাসা-ভাসা অভিজ্ঞতা এদেরকে প্রসঙ্গ ও প্রকরণ—দুই সম্পর্কে উদাসীন করে তুলেছে। প্রসঙ্গ ও প্রকরণজ্ঞানহীন সাংবাদিক কলম যে অরূপরীতির সৃষ্টি করছে, তার মরীচিকা সার্থক ছোটোগল্প পড়ার সূত্রে কেটে যেতে পারে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে মনে করা হল পরশুরাম-ত্রৈলোক্যনাথের সার্থক উত্তরসূরি (শ্বেত পাথরের থালা পড়ে)। কিন্তু অতি প্রজননতায় তিনিও অসার এমনকি কামনার কূপ খুঁড়ে গল্প লিখে চলেছেন। ফ্রাঙ্ক ওকোনর আমেরিকান ছোটোগল্পকে 'জাতীয় শিল্পরূপ' (ন্যাশনাল আর্টফর্ম) বলেছিলেন। কেননা এডগার অ্যালান পো থেকে শুরু করে স্যালিঞ্জার পর্যন্ত এক ঐতিহ্য বহমান আছে। আমরা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিকের পরে পঞ্চাশের দশক অবধি এক প্রসঙ্গনিষ্ঠ ও প্রকরণনিষ্ঠ গল্পলেখকদের সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারি।

আগের দুটি অনুচ্ছেদে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের হঠকারিতা নিয়ে লেখার কারণ, ছোটোগল্পে একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকবেই। সেক্ষেত্রে শিল্পের একটি সামাজিক দিকও আছে। সমাজের ছোঁয়া বাঁচিয়ে, ব্যক্তি-অনুভূতির বিকারে লেখা ছোটোগল্প নামের রিপোর্টাজ বা হালকা গল্প সম্পর্কে আলোচকের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। নইলে এসব রচনার গুরুত্ব খুঁজতে গিয়ে সময় ও প্রতিভার অপব্যয় হতে বাধ্য। আবার আমাদের বলা ছোটোগল্পের

রূপসাধনার বিশেষত্ব বোঝাতে এইসব উদাহরণ প্রয়োগের প্রয়োজন নেই, এটা সুনিশ্চিত করতে এই আলোচনা করা হল।

একান্তভাবে শৈলীসন্ধানী পাঠক হয়তো এ অবধি পড়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ছেন। তাই এবারে ছোটোগল্প বিচারে শৈলীর পরিচয় কী করে লাভ করতে পারি, তার বিষয়ে বলা যাক।

১. ভালো-লাগা বা আলোচ্য ছোটোগল্পটি ঠিক কীভাবে আমাদের ভালো লাগল, তার সন্ধান করা চাই। একটি চরিত্র বা ঘটনার মধ্য দিয়ে তা আমাদের অভিজ্ঞতার কোন্ বিশেষ দিকটিকে স্পর্শ করল, সেটা দেখা দরকার। কেননা, এমন হতে পারে যে দ্বিতীয়বার পড়ার সময় গল্পটি কোনো দাগই কাটতে পারল না। আবার এই ভালো-লাগাকে নিজেদের পঠন-অভিজ্ঞতা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। 'শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এভাবে ভাবেন' এরকম আপ্তবাক্যের আড়ালে হয়তো কুম্ভীলকবৃত্তি (প্লাগারিজম) লুকিয়ে থাকে। পাঠকের য়ুরোপীয় গল্পপাঠের অপরিচয়ের সুযোগ হাল আমলের বাঙালি গল্পলিখিয়েরা নেন। ঋণী থাকেন, কিন্তু ঋণ স্বীকার করেন না। তাই আলোচকের বহুপঠনের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। তবে ঋণ বোঝাতে গিয়ে জোর করে কোনো সিদ্ধান্তে না আসাই ভালো।

২. আলোচ্য গল্পটির জাত-বিচার (ক্লাসিফিকেশন) একটি গুরুতর প্রশ্ন। গল্পটিতে প্রকৃতি থাকতে পারে, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি থাকতে পারে। এই উপাদানগুলোর মিশ্রণের অনুপাত ও কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। নইলে চরিত্র-ঘটনাপ্রধান, মনস্তাত্ত্বিক, রহস্যময়, প্রকৃতিপ্রধান ইত্যাদি নামকরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। অবশ্য উপন্যাসের মতো নানা উপাদানের মিশ্রণের জটিলতা সাধারণত ছোটোগল্পে মেলে না। কিন্তু প্রেম, মানসিক অনুভব মাঝে মাঝে গল্পের জাত বিচারে বাধা আনে। যেমন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'খিল' গল্পে দুই পুরনো প্রেমিক-প্রেমিকার কথা আছে। মৃতদার প্রেমিকের পাশের ঘরে একটি রাত্রির মতো চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য আসা প্রেমিকা আশ্রয় নেয়। মাঝরাতে দুঘরের মাঝখানের দরজার খিল খুলে যায়। আলো এসে পড়ে প্রেমিকের চোখে। অথচ পরের দিন হঠাৎ চলে যাওয়ার পর সে জানতে পারে অশোকা নামে কোনো প্রার্থীকে চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়নি। তাহলে মেয়েটি কি প্রেমিকের চরিত্রের সরলতা পরীক্ষা করতে এসেছিল? খিল খুলেছিল সত্যিই দরজার না তা প্রেমিকের অবচেতন মনের রুদ্ধ দুয়ার খোলার ইঙ্গিত? এমন পরিস্থিতিতে গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক না মামুলী প্রেমের, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব জাগে। তবে সাধারণভাবে যে-কোনো একটি উপাদান বড়ো হয়ে গল্পটির বর্গকে সুনিশ্চিত করে। তবে উপন্যাসের মিশ্রবর্গীয়তার নমুনা ছোটোগল্পে বড়ো একটা দেখি না।

৩. পূর্বোল্লিখিত গল্প বলার ভঙ্গিটিও লক্ষ করতে হবে। এর মধ্যে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতাকে ধরা যাবে। এর মানে এই নয় যে, গল্পের সারসংক্ষেপ করতে হবে। ভাবনির্যাসের অগ্রগতি (প্রোগ্রেসন অব্ এসেন্স) লক্ষ করতে হবে ঘটনাজালের মধ্যে। এখানে কিছু কাট-ছাঁট হতে পারে। অনেক সময় টুকরো টুকরো কাহিনী বা চরিত্রের ছিন্নকথনের মাধ্যমে একটি ছোটোগল্প গড়ে উঠতে পারে। এই ছিন্ন কথামালার সার্থকতা তাদের গোপন অবিচ্ছিন্নতায়। সেইসব ঘটনাই কাজে লাগবে, যারা ভাবনির্যাসের বহিঃরূপ। গল্পলিখিয়ের মূল উদ্দেশ্য যারা সফল করছে, তারাই গল্পকথনের কয়েকটি বিন্দু। উপন্যাসের আয়তন থাকে না বলে ছোটোগল্পে ঘটনার অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

৪. ছোটোগল্পের গঠনশৈলী আলোচনা যেমন শিল্পরূপের হদিশ দেয়, তেমনি ছোটোগল্পের ভাষাভঙ্গি অবহেলার যোগ্য নয়। লেখকের প্রকাশমাধ্যম হল ভাষা—চরিত্র, ঘটনা, মৌলিক ভাবনা, গঠনকৌশল সবই ভাষার আশ্রয়ে প্রকাশ পায়। উপন্যাসের ভাষার পটচিত্র অনেক বড়ো। সেখানের সব ভাষা-বদলের (ল্যাংগুয়েজ শিফ্‌ট্) আলোচনা ভাষাবৈজ্ঞানিক ব্যায়াম হলেও তা ক্লান্তিকর। কখনও ভুল বুঝে লেখকের ব্যবহৃত শব্দের তালিকা প্রস্তুত করে তার অভিধানগত অর্থ এবং লেখকের ভাষাব্যবহারের পার্থক্য গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সংখ্যাতত্ত্ব বা অভিধান এভাবে মনোযোগ কাড়লে সাহিত্যবোধ যায় কোথায়? তাই উপন্যাসের তুলনায় ছোটোগল্পের ভাষা বিশ্লেষণ সহজসাধ্য। ছোটোগল্পে ভাষা চাবিকাঠির মতো চরিত্র-ঘটনা-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে লেখককে চিনিয়ে দেয়। শাণিত বাক্যরীতির আড়ালে রচয়িতার বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিনির্ভরতা নিজেকে প্রকাশ করে। আবার আটপৌরে ভাষায় আস্থাবান লেখক তার বক্তব্য বলেন নিচু সুরে। বাক্যের শাব্দিক ধ্বনিগত মন্থর ভঙ্গি পাঠকের ভাবচর্বণায় সাহায্য করে।

এই ভাষাবদল লেখকজীবনের নানা পর্বে নানারকম হতে পারে। এমনকি বিষয়ও ভাষার বদলে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের উনিশ শতকের নব্বুই দশকের গল্পগুচ্ছের সঙ্গে 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলির ভাষার দুস্তর ফারাক। আধুনিক হবার বাসনা যেমন এখানে সক্রিয়, তেমনি গদ্যের শাণিত সংক্ষিপ্ত রূপের প্রতি আধুনিকদের টান—এর কারণরূপে দেখা চলে। তবু একটি হাজির হওয়ায় অপরটি গরহাজির থাকে না। দুটি ধারাই বহমান থাকে। কথকতার আপাত নিস্তরঙ্গ বর্ণনাত্মক গদ্য আর উইট্-প্রধান গদ্যের ভাষার পিছনে আরেকটি কারণ থাকে। প্রচল স্থির, শান্ত গদ্যভঙ্গি থেকে সরে আসার দুঃসাহস সকলের থাকে না। বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছনোর তাগিদে চলে-আসা ভাষারূপ যথেষ্ট মনে হয়। আর শাণিত বাক্যমালার লেখকরা শহুরে শিক্ষিত পাঠককে কাছে পেতে চান। তার জন্য গুণগ্রাহী কমলেও তাঁরা পিছপা নন। দ্বিতীয় কারণটি খুঁজে পেলেও তাকে যথেষ্ট যুক্তিতথ্য দিয়ে এই মুহূর্তে সাজানো যাচ্ছে না। তবু ভাবা যেতে পারে যে, ব্যক্তি-সমাজকে চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্য প্রচল গল্পভাষার চেয়ে উইট্-প্রধান ভাষা অনেক বেশি সক্রিয় সাহায্য করে। তাই ছোটোগল্পের ভাষা নির্বাচনের পেছনে লেখকের সংপ্রেষণের বিশেষ কামনা লুকিয়ে থাকে।

কখনও ছোটোগল্পের ভাষা উইট্ ছাড়িয়ে সংকেত-ভাষার (কোড-ল্যাংগুয়েজ) সীমানায় পৌঁছয়। এখানে পাঠক-লেখকের সংযোগের চেয়ে বিশেষ ভাষা সৃষ্টির কৌশল বেশি প্রশ্রয় পায়। তন্ত্রে মন্ত্রের যেমন একটা গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা থাকে, তেমনি গল্পভাষাকে ব্যক্তিমনের নির্মাণশালায় এমন একটি রূপ দেওয়া হয় যেখানে পাঠক বিপন্নবোধ করে। লেখক ভাষার ব্যায়ামকে পছন্দ করেন একটা নিজস্বতার রং ছড়ানো যায় বলে। বাংলা ছোটোগল্পে কমলকুমার বা অমিয়ভূষণ মজুমদার এমনতরো ভাষা গড়েছেন। ভাষাকে বাজাতে গিয়ে কখনো তার ছিঁড়ে গেছে। শ্রোতা এলোমেলো সুরে অসহায় ভূমিকা পালন করছেন। বীণাকার শুধু আপনমনে বাজিয়ে চলেছেন। পৃথিবীর সার্থক গল্পগুলির মধ্যে এমন সংযোগহীনতা নেই। তবু কেন এমনটি হয়। এরও কারণ আছে—১. প্রচল গদ্যভাষায় এইসব লেখকের অনাস্থা জন্মেছে ২. ভাষায় একটা নিজস্বতা, চারিত্রের ছাপ ফেলার তাগিদ ৩. ভাষাকে একটু বাঁকিয়ে-চুরিয়ে গদ্যের সহনক্ষমতা (টলারেন্স) পরীক্ষা ৪. অভিনব ভাষা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ইত্যাদি।

প্রচল বা শাণিত গল্পভাষা ব্যবহার করলেও বাক্যগঠনে অনেক সময় একটা নিজস্ব ভঙ্গি এসে পড়ে। মানিক

এবং আরো অনেকে বাক্যকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ভাবটা অনেকটা এইরকম—বুঝ জন যে জানহ সন্ধান। প্রসঙ্গ এখানে প্রবল বলে আমরা এই গদ্যবিশেষত্বকে (অগঠিত বা অসম্পূর্ণ বাক্যমালা) তলিয়ে দেখি না। আমাদের মনে হয় এখানে ভাষা-বিন্যাসের মধ্যে লেখকের একটা মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ কিংবা পাঠকের বোধশক্তির পরীক্ষা করার প্রবৃত্তি চেহারা পেয়েছে।

কবিতায় যেমন গল্পের ঢেউ এসে লাগে, তেমনি ছোটোগল্পে কবিতার রঙ লাগা বিচিত্র নয়। রোমান্টিক মন অথবা স্রষ্টার কবি-পরিচয় ভাষাকে গদ্যের কঠোরতা থেকে আবেগ ও অনুভূতির কোমলতায় উত্তীর্ণ করে। অনেক সময় যুক্তি-তর্ক-বুদ্ধির অজস্র পঙ্‌ক্তির চেয়ে একটি কাব্যিক পঙ্‌ক্তি অনেক বেশি ভাবায়। তবে ভাষার এই কাব্যিকতাদান ভাবপ্রধান গল্পে মানালেও বাস্তবতার প্রখরতাকে নিরুত্তেজ করে তোলে। কাজেই কাব্যের দাবিতে নয়, গল্পের দাবিতে কাব্যিকতা যদি আসে, তা বরণীয়। সঙ্গে সঙ্গে কাব্যিকতা যদি আবেগের জলাভূমি তৈরি করে, তবে তা বর্জনীয়।

বিজ্ঞাননির্ভর ছোটোগল্পগুলিতে বিশেষ প্রতিবেশকে ফোটাতে গিয়ে লেখকরা পারিভাষিক শব্দের দিকে মনোযোগী হচ্ছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, আঞ্চলিক ভাষা এবং উপভাষা এমনকী গোষ্ঠী ভাষাও লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্যকে সফল করে। তবে পরিভাষা বা উপভাষার মোহে গল্পের মূল ভাবনাটি যদি অস্পষ্ট হয়ে পড়ে তবে তা শিল্পগুণের হানি করে।

ছোটোগল্পের ভাষা প্রসঙ্গে শেষ কথা হল, গল্পকার বিষয়ের উপযোগী যে ভাষাকেই বাছুন না কেন, তাকে সংপ্রেষক (কম্যুনিকেটিভ) হতে হবে। সে সংপ্রেষণ মুষ্টিমেয় বা বৃহৎ জনসাধারণের সঙ্গে যেমনই হোক না কেন।

৫. শৈলী বলতে যারা একান্তভাবে ভাষারূপের বৈচিত্র্যসন্ধানে তন্ময়, তাঁদের সঙ্গে এই আলোচকের তফাত আছে। আমরা ছোটোগল্পকে একটি শিল্পকর্ম ভাবছি, যার অবয়বে (স্ট্রাকচারে) প্রসঙ্গ ও ভাষার স্থান আছে। এই স্থান-দেওয়ার প্রণালী একরকম হতে পারে না। স্রষ্টার সামনে প্রসঙ্গের সম্ভার সাজানো থাকলেও রূপের তাড়নাও থাকে। প্রসঙ্গকে প্রকরণের মাধ্যমে প্রকাশের কৌশল ভিন্ন হয়ে যায় একটি বিশেষ কারণে। তা হল লেখকের বিশ্ববীক্ষার সূত্রে। ছোটোগল্পের মিতায়তন মনে রাখলে এই বীক্ষণ খানিকটা খণ্ডিত হতে বাধ্য। কিন্তু প্রসঙ্গ বা প্রকরণের নূতনত্ব লেখকদের সামান্যত পৃথক করে। সবচেয়ে বড়ো কথা লেখকের দৃষ্টিকোণ যা দিয়ে তিনি প্রসঙ্গ ও প্রকরণের নবরূপ খোঁজেন।

এই দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের জন্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বাস্তবতার ঘেরাটোপে রোমান্টিকতা ও রোমান্সের প্রদীপ জ্বালেন, মানিক সামাজিক সমস্যা তুলেও মনস্তত্ত্বকে এড়ান না। তারাশংকর অবক্ষয়ী সমাজের মধ্যে 'গোটা মানুষের মানে' খোঁজেন। সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর মধ্যবিত্ত চিত্র, ইন্দ্রিয়ঘনতায় সফল হন। সুবোধ ঘোষ যন্ত্রকে মানবীয় করে তোলেন। মতি নন্দী মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের আপাততুচ্ছতাকে তীক্ষ্ণ কলমে আঁকেন।

জীবনে সদর্থকতার চিহ্ন যারা খুঁজে পাননি, তাঁরা সামাজিক পচনকেই প্রকৃতিবাদীর কলমে ফুটিয়ে তোলেন। শিল্পের জন্য শিল্প, বাস্তবতার জন্য বাস্তবতা কিংবা শিল্পীর সামাজিক দায়দায়িত্ব আছে—এ নিয়ে বিরোধ থাকলেও ব্যক্তিমন কীভাবে চারপাশে সমাজ ও প্রকৃতিকে দেখছে, তা ছোটোগল্পের ভাঙা পটে ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে

লেখকের দৃষ্টিকোণ জানতে একটি গল্প যথেষ্ট নয়। গল্পমালার মধ্যে স্রষ্টার মালাকার হিসাবে সার্থকতা এবং জীবন-দর্শনের একটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। তবে একটি গল্পের অবয়ব ও ভাষা বিশেষ শিল্পকৃতিটির শৈলী জানায়। ছোটোগল্পের শৈলীর আলোচনায় তাই একজনের একটি গল্প বা গল্পসমগ্রে দুই স্তরের হতে বাধ্য। একটি গল্পে লেখকের প্রকাশ্যে হাজির হওয়ার সম্ভাবনা কম। গল্পসমগ্রে তাঁর বিশেষ প্রবণতা, সামাজিক মন, শিল্পরূপচেতনা ধরা পড়ে।

৪.২ ❑ পথহারা পথিক

এই লেখাটি ছোটোগল্পের শৈলীর প্রথম আলোচনা নয়। গল্পের প্রকরণ নিয়ে ভাবনা বিস্তর হলেও অবয়ব-ভাষার সমঝোতার প্রশ্নটি অনালোচিত থেকে গেছে। গল্প আলোচনায় ভাষার উজ্জ্বল বা বিবর্ণরূপ সামান্য জায়গা দখল করেছে প্রাক্তন সমালোচনায়। অবয়বের প্রশ্নে আবার কোনো আলোচক অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম ভেঙে নানা সারণি, ছক সাজাচ্ছেন। শিল্পীর অবয়ব-পরিকল্পনাকে সূত্রাকারে প্রত্যক্ষ করানোর চিত্ররূপ জরুরি হলেও বৈজ্ঞানিক ধারণার অপ-ব্যবহার অনুচিত। একটি ছোটোগল্প কোন্ গুণে সার্থকতা পেল, পাঠকমনে প্রভাব ফেলল এসবের সংক্ষিপ্তকরণে, ভাষার অতি-বিস্তারের বদলে ছক-সারণি আসতেই পারে। প্রসঙ্গ ও প্রকরণের জৈবিক একতা (অর্গানিক ইউনিটি) সামাজিক ও মৌলিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় সাহায্যই নিতে পারে। আমরাও বিজ্ঞানের সামাজিক উপযোগিতায় বিশ্বাসী। শুধু তার অচেতন ব্যবহারে ব্যথা পাচ্ছি। আলোচকরা একটি ছোটোগল্প বা গল্পসমগ্রের শিল্পবিচারে সামাজিক বিজ্ঞানে আস্থাবান নিশ্চয়ই হবেন। শুধু প্রয়োগের ক্ষেত্র, সামর্থ্য এবং পরিমিতিবোধ থাকা দরকার। সমালোচনার পথ থেকে, সাহিত্যবোধের জ্ঞান থেকে দিকভ্রান্তরা আমাদের এই সমাপ্তি অংশ লিখতে বাধ্য করল, এমন বলা যায়।

এবার তত্ত্বকথা ছেড়ে একটি ছোটোগল্পের অন্দরমহলে যাওয়া যাক। পাঠক বিশ্রাম পাবেন আর আমরাও সেই অবসরে ছোটোগল্পের শৈলীর পরিচয় পাব।

৪.৩ ❑ উদাহরণ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুষ্করা'

আমাদের আলোচ্য গল্পটি হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুষ্করা'। এটি 'দুঃশাসন' গল্পগ্রন্থে (১৯৫২) সংকলিত হয়েছিল। আবার ১৯৫৪-তে প্রকাশিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পে'ও স্থান পেয়েছে।

গল্পটির পরিণতি বীভৎস। সামাজিক ক্ষতের চেহারা অসাধারণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ, এই গল্পের পরতে পরতে একটি সময় আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই সময় বড়ো দুঃসময়। কেননা তা ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। তখন মারী ও মড়ক বাঙালি সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। দুর্ভিক্ষও জীবনের মেয়াদ কমানোর ষড়যন্ত্র করেছে। শুধু শারীরিক মৃত্যু নয়, মানসিক এক দো-টানাও বাঙালি সমাজের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। মানুষের দ্বারা মানুষের নিগ্রহ কারো কারো মনে উজানের দিকে গিয়ে দৈবকে আঁকড়ে ধরেছিল সনাতন ভারতীয় পন্থায়। এরকম একজন দৈববিশ্বাসী পুরোহিত তার সংস্কারকে বড়ো করে দেখেছে এই গল্পে। তার সংস্কার-অর্জিত স্বপ্ন সফল হয়। কালীমূর্তির আবির্ভাব, প্রসাদগ্রহণের আড়ালে মানুষের বাঁচার কামনা তার চোখে অস্পষ্ট থেকে

গেছে। একদিকে দৈববিশ্বাসে অন্ধ, অন্যদিকে বাঁচবার নির্মম প্রয়াস এই গল্পে স্থান পেয়েছে। বহমান সময়, কালের নখর, অন্ধ বিশ্বাস, নির্মম সত্যের উচ্চারণে গল্পটি চূড়ান্ত শিল্পরূপ লাভ করেছে।

গল্পটি এইরকম। গ্রামীণ মানুষকে ওলাদেবীর রাগ থেকে বাঁচাতে এক শুক্লা চতুর্দশীর রাতে তর্করত্ন শ্মশানকালীর পূজায় বসেছিলেন। এই পরিবেশ এবং প্রকৃতির ভয়ংকর রূপ লেখক অসাধারণ ভাষায় চিত্রিত করেছেন। সমস্ত গ্রাম জুড়ে পদধ্বনি, চারদিকে শ্মশানের শান্তি, নীরবতা। এরই মধ্যে তর্করত্নের শিবাভোগ প্রায় ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনি জানেন যে এই ভোগদান ব্যর্থ হলে গ্রামে পুষ্করা লাগবে। রাতশেষে শিবা নয়, দেবীই নিজের হাতে ভোগ নেন। এই অলৌকিক ঘটনায় তর্করত্নের প্রণামী তিনশো থেকে পাঁচশো হয়, ভোজ্যবস্তুতে গোরুর গাড়ির অর্ধেক ভরতি হয়ে যায়। পরের দিন, কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে বাড়ি ফেরার পথে তর্করত্নের চোখে যখন দেবীর লক্ষ্মীরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন রাস্তার ওপর এক ডোমনীর মৃত্যুযন্ত্রণার ছবি লেখক ফুটিয়ে তোলেন। তর্করত্ন, কাশী কুমোর ও গ্রামবাসীরা নিজেদের বিশ্বাসে ভর দিয়ে থাকলেও লেখক জানান যে ঐ ডোমনীই শ্মশানকালীর শিবাভোগ খেয়েছিল। দীর্ঘ অনাহারের পর ঐ রাজকীয় ভোগ তাকে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে দিয়েছে। মানুষের বাঁচার কামনা এবং অন্ধ সংস্কার শ্মশানকালীর পুজোতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। কিন্তু ঐ অভাগিনী দেবাতর ভোগ পেয়েও জীবন বাঁচাতে পারেনি। সংস্কারকে অগ্রাহ্য করার শক্তি সে পেয়েছিল ক্ষুধার জ্বালা থেকে। কাহিনীটিতে মানসিক সংস্কারের মূঢ়তা যেমন একদিকে উপহসিত, অন্যদিকে যুদ্ধের সময় মানুষের চরম দুর্দশা জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে।

এ তো গেল প্রসঙ্গ কথা। এবার প্রকরণবৈশিষ্ট্য বা শৈলীবৈশিষ্ট্য বিচার করা যাক :

১. গল্পটি পাঁচটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। সেগুলির পরিকল্পনা এইরকম—

ক. শ্মশানস্থলের বর্ণনা। অসময়ে কালীপূজার কারণ। শিবাভোগের সমাপ্তির জন্য তর্করত্নের কাতর প্রার্থনা। পূজার বিশদতা। শুক্লা চতুর্দশীর মধ্যরাত্রি।

খ. শ্মশানস্থল এবং জীবন্ত মানুষের শ্মশানের পাশাপাশি বর্ণনা। তর্করত্নের বিশ্বাস আর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বৈপরীত্যবোধ। কালীমূর্তির বীভৎসতা। তর্করত্নের পূজার নিষ্ফলতার বিচলন—তাঁর ধ্যানমূর্তি। তৃতীয় প্রহর। এরই সঙ্গে এই পূজায় তাঁর আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আঁকা হয়েছে।

গ. কালীমূর্তির আবির্ভাব। তর্করত্নের সাধনায় সিদ্ধিলাভ। গ্রামীণ সমাজে আলোড়ন। চতুর্থ প্রহরের ঘটনা।

ঘ. গ্রাম্য সমাজের প্রতিক্রিয়া। কাশী কুমোরের মিথ্যাচার (দেবীকে স্বচক্ষে দর্শন)।

ঙ. তর্করত্নের বিদায়যাত্রা। একদিকে পুষ্করা রোধে তার সফলতা, অন্যদিকে লক্ষ্মীর পুণ্যস্পর্শে গ্রামকে নূতন রূপে দেখার স্বপ্ন। মাঝে আছে ডোমনীর মুমূর্ষু শরীর। পরিণামে লেখকের আশাবাণী—মারী-মড়কের সমস্ত বিষ গ্রামীণ মানুষরা নীলকণ্ঠের মতো পান করে বলে পুষ্করা কেটে যাবে। কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যা।

২. কাহিনীকাল বিচার করলে দেখতে পাই তা ঘটতে একটি পুরো দিনও লাগেনি। শুক্লা চতুর্দশীর মাঝরাত থেকে কোজাগরীর সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটনাকাল বিস্তৃত। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বাঙালি সমাজের এক নিদারুণ ছবি আঁকা হয়ে গেল। 'পুষ্করা' কথাটির অর্থ অভিধানগতভাবে—ক্রুরবার ভদ্রাতিথি ভগ্নপাদনক্ষত্রঘটিত অশুভ যোগভেদ। সেই অশুভ তিথি যাতে না আসে সেজন্য গ্রামীণ মানুষের সংঘবদ্ধ পূজাদান। দেবতার কাছে এই

কল্যাণপ্রার্থনা ডোমনীর প্রসাদগ্রহণে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বিদ্ধ হয়েছে। ক্ষুধিত মানুষ দেবতার অন্ন ভোগ করতে চায়। মৃত্যু ঘটে দেবতার হাতে নয়, অপরিমিত আহারের জন্য। একদিকে ক্ষুধার জ্বালা, অন্যদিকে দেবতার কল্যাণপ্রার্থনায় প্রসাদের থালা সমাজের দুটি অভিজ্ঞতার চিহ্ন। সমকাল ক্রিয়া করে প্রথম অংশে। দৈবানুগ্রহ লাভে তৎপরতা আমাদের হাজারো বছরের অর্জিত সংস্কাররাজ্যে নিয়ে যায়। দুটো ঘটনাই এককালে লগ্ন—ক্ষুধার তাড়নায় নিরূপায়তা এবং দেবতা সম্পর্কে সংস্কার। সংস্কারের অন্ধকার চিরে সামাজিক সত্যের যে নিষ্ঠুর আত্মপ্রকাশ আমরা দেখি, তা অমানবিক বীভৎস হলেও স্বাভাবিক।

৩. এবারে ভাষা প্রসঙ্গে আসা যাক। এই তীক্ষ্ণ সমাজসন্ধানী গল্পটির ভাষায় নাটকীয়তা আছে। নাটকীয়তা এসেছে পূজা ও পূজাস্থল, দেবীর ভোগগ্রহণে ভক্তদের প্রতিক্রিয়া বোঝাতে। এর জন্য সংলাপ অবশ্যই সাহায্যে এসেছে। সেইসব জায়গায় বক্তাদের চরিত্রের আভাস দিতে কতকগুলি বিশেষণ লেখক খুঁজে নিয়েছেন। এর মধ্যে চরিত্রের লক্ষণ স্পষ্টতা পেয়েছে। যেমন, অসহায় কাতর দৃষ্টিতে চারদিক তাকিয়ে বলা, শুকনো মুখে বলা, কাতর আর্তকণ্ঠে আহ্বান করা, কান্নায় কাঁপা গলা, ধমক দিয়ে বলা, ভীত শুকনো গলায় বলা, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করা, তর্করত্নের সংস্কারগ্রস্ত মনের নানা প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেছে। তেমনি কাশী কুমোরের কণ্ঠে শুনি নিঃস্বের অবিচল কণ্ঠস্বর :

'আচ্ছা, থামলাম। ন্যাংটোর আবার বাটপাড়ের ভয়। আমার তো সবই ওলা-দেবীর পেটে গেছে। বউ ব্যাটা সমস্তই। পুষ্করাই লাগুক আর ঘোড়ার ডিমই লাগুক—ওতে আমার কী হবে ঠাকুর।'

৪. পরিবেশ চিত্রণে আবার বর্ণনামূলক ভাষা দেখি। সেই ভাষাও পরিবেশের বীভৎসতাকে ফুটিয়ে তুলেছে :

ক. নদীর জল 'কালো আর পিঙ্গলে মিশে যেন হিংস্রতার রূপ নিয়েছে।'

খ. ওপারের বনজঙ্গালগুলো রাশি রাশি বিচ্ছিন্ন আর আকারহীন বিভীষিকার মতো জেগে রয়েছে।

গ. তার ওপরে বড় একটা জবাফুল, পেট্রোম্যাক্সের আলোতে চাপবাঁধা খানিকটা রক্তের মতো দেখাচ্ছে।

ঘ. আধপোড়া হাড়, মানুষের মাথা, চিতার কয়লা, পোড়া বাঁশ আর রাশি রাশি ভাঙা কলশি।

ঙ. বিদ্যুতের সর্পিল চমক; একটা নিষ্ঠুর রক্তাক্ত হাসির মতো

চ. বাতাসে মড়ার গন্ধ ভাসছে

ছ. মড়াখেকো শ্মশানকুকুরের একটানা কান্না

জ. একমাথা ঝাঁকড়া চুল, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি। তার দাঁতের চাপে হাড়গুলো মড় মড় করে ভেঙে যাচ্ছে।

ঝ. চারিদিকে রন্ধ্রহীন অন্ধকার, কালো অন্ধকার, পচা মড়ার গন্ধ, আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় কালো বৃষ্টি গলে পড়ছে।

ঞ. মরা নদীর জল আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল, ওপারের ন্যাড়া শিমুল গাছে ডুকরে উঠল শকুনের বাচ্চা।

এ সব উদাহরণ যেমন গেল দশটি বীভৎস ছবির বর্ণনা, তেমনি শান্ত রসের চিত্রণেও লেখক কার্পণ্য করেননি। যেমন :

ক. মাঠ-উজ্জ্বল চাঁদের আলোর দিকে দিগন্তে ধানের শীষ দুলছে—চমৎকার ফলন হয়েছে এবার।...পথের দুপাশে কাঠমল্লিকার ফুল যেন গন্ধের মায়া বিস্তার করে দিয়েছে।

খ. চাঁদের দুধে ধানের শীর্ষ পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে। ফসলের ভরা ক্ষেতের মধ্যে থেকে থেকে একটি করে প্রদীপের শিখা। শস্যলক্ষ্মীকে আহ্বান করছে মাটির মানুষেরা, তাঁর পায়ের ছোঁয়া লেগে ক্ষেতের ধান সোনা হয়ে যাবে। কাঠমল্লিকার সুরভিতে কি তাঁরই শ্রীঅঙ্গের পদ্ম-গন্ধ?

গল্পটিতে জীবনের নিষ্ঠুর সত্যের উচ্চারণ বেশি প্রয়োজনীয় বলে বীভৎসের তুলনায় শান্ত দৃশ্যের বর্ণনা কম। তবু শেষ দুটি উদাহরণ একটা বৈপরীত্যের ব্যঞ্জনা জাগায়।

৫. গ্রামটি অচিহ্নিত। বাংলাদেশের যে-কোনো গ্রামে এটি ঘটতে পারত। তাই উপভাষা নেই। কিন্তু ইতর দেশি শব্দে চলিত ক্রিয়ার বিন্যাসে সংলাপ, চরিত্র নির্দিষ্ট মাত্রা পেয়েছে। যেমন—পাত্তা দেখা, রাত কাবার, পুজো-আচ্চা, ভালো করে ডাকা, ভোগ খাওয়ান, গাঁজার ঝোঁক, মড়াখেকো, পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দেওয়া, উচ্ছন্নে যাওয়া, যা কপালে আছে, তাই হবে; চিমসে লুচি, পোয়াটাক বোকা পাঁঠার মাংস, বয়ে যাওয়া, হারামজাদা, ঘোড়ার ডিম, শরীর হিম হওয়া, থর থর করে কাঁপা, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করা, সত্যি মিথ্যের রঙ চড়ান, চামড়া উঠে যাওয়া, লীলে, পেটের পিলে, চড়াৎ করে ফাটা, বেটা আর সোয়ামী, কাতরানো, যমে ধরা, জিভ মেলে হাঁপানো।

৬. এই গল্পে লেখকের ভাষাব্যবহার অবহেলার নয়। একটি প্রসঙ্গের সজ্জায় অবয়ব ও ভাষা কীভাবে সযত্ন মনোযোগে অনুস্যূত, তা দেখা গেল। গল্পটির পাঁচটি অনুচ্ছেদ যেমন স্তরে স্তরে আরোহী, যেমনই উপমার প্রাচুর্য, ইতর-দেশি-চলিত বাগভঙ্গির প্রাধান্য গল্পটিকে ঈপ্সিত শিল্পরূপদান করেছে। 'পুষ্করা' পড়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পারি। সমাজের এক পঙ্গু অবস্থাকে তিনি দেখাতে চান। সেই চাওয়াকে সম্ভবপর করে তোলার জন্য এক তীব্র গতির ভাষা ব্যবহার করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা অবয়বের পঞ্চাঙ্গ সাজালেও পাঠক এক নিশ্বাসে গল্পের শেষে পৌঁছোন। পরিণামে লেখকের আশাবাণী অনুপ্রবিষ্ট কথকের (ইনট্রুডিংন্যারেটর) আভাস সঞ্চার করেছে :

'কিন্তু তবু পুষ্করা কেটে যাবে। মারী ও মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই তো নীলকণ্ঠের মতো পান করে নেয়।'

লেখক এভাবে কাহিনীতে অনুপ্রবেশ করলেন কেন? ডোমনীর নিদারুণ মৃত্যুতে জীবনপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায় না, তা বোঝানোর জন্য। বিশেষ বিশ্বাসকে তিনি তাই আলগাভাবে কাহিনীতে আনেননি, তাকে প্রয়োজনীয় করেই এনেছেন। কেননা গল্পটি ছিল প্রত্যাশাভঙ্গের। মানবজীবনের প্রতি আস্থা-বিশ্বাসই লেখককে সদুক্তি উচ্চারণে প্রেরণা দিয়েছে। লেখকের সমাজসচেতন, মানবপ্রেমী রূপটি আরও স্পষ্ট হয়েছে পাঠকের কাছে।

ছোটোগল্পের শৈলীবিশ্লেষণের এখানেই ইতি টানা হচ্ছে। একটি গল্প হয়তো আমাদের তাত্ত্বিক উচ্চারণের যথেষ্ট সাক্ষ্য দিল না। আমরা শৈলীবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োগসামর্থ্য একটি নমুনায় ধরতে চেয়েছিলাম। তৎপর আলোচকরা এ থেকে সূত্র নিয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখাবেন, এমনটি আশা করা যায়।

❑ উৎসগ্রন্থ ও প্রবন্ধ

১. আশিস্‌কুমার দে (১৯৮৪), ছোটোগল্পের শৈলী, ভাষা পত্রিকা, ৩ বর্ষ ২ সংখ্যা।

২. পবিত্র সরকার (১৯৮৫), রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প, গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক।